Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

Damodar Nod Tirboti Jharkhande Procholit Bibhasa: Ekti khetro samikha

দামোদর নদ তীরবর্তী ঝাড়খন্ডে প্রচলিত বিভাষা: একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা

Sarmistha Acharyya
HOD, Deptt. of Bbengali
Sindri College, Sindri, Dhanbad, Jharkhand, India
(Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, Dhanbad, Jharkhand)

ড. শর্মিষ্ঠা আচার্য
বিভাগীয় প্রধান,বাংলা বিভাগ
সিন্দ্রী কলেজ, সিন্দ্রী, ধানবাদ, ঝাড়খন্ড
(বিনোদ বিহারী মাহাত কোয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ,ঝাড়খণ্ড)

ভাষার সাহায্যে মানুষ তার মনের ভাব ব্যক্ত করে। মানুষের চিন্তা ও মননের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হলো ভাষা। শুধু তাই নয় যেকোন দেশের জাতির ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকও হলো ভাষা।একসঙ্গে বসবাসকারী বহু ভাষাভাষীর মানুষ এই ভাষার মাধ্যমে ভালোবাসার আদান-প্রদান করেন। যেমন; সাঁওতালি, খর্থা কুড়মালি হিন্দি প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা এত ঘনিষ্ঠ কেন তা অনুসন্ধান করেছেন ডক্টর সুহৃদ কুমার ভৌমিক তাঁর 'আদিবাসীদের ভাষা ও বাংলা' গ্রন্থে। তার মতানুসারে চর্যাপদে দেখি সাঁওতাল তথা সমগ্র আদিবাসী জীবনের বিস্তৃত ছবি। সে চিত্র এখনো জীবন্ত ভাবে দেখতে পাই ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে - যার সীমানা রাঁচি, হাজারীবাগ, পালামৌ, ধানবাদ থেকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূমে এসে ঠেকেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-
" মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা। "- এই বাণীতে লুকিয়ে আছে বাংলা ভাষার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কিন্তু এই বাংলা ভাষাকে নিয়ে ভারতের মাটিতে রাজনীতিও কম হয়নি। বলাই বাহুল্য, আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকেও এই রাজনীতির শিকার হতে হয়েছে কখনো কখনো। ভাষাকে কেন্দ্র করে দেশ,জাতি, রাজ্যের বিভাজনের সাক্ষী থেকেছে মানুষ যুগে যুগে। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধেও আমরা দামোদর তীরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ড সীমানা লাগোয়া অঞ্চলের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ও তার ফলস্বরূপ সৃষ্ট নতুন ভাষা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি এই ভাষাকেন্দ্রিক আঞ্চলিক বিভাজনের ইতিহাসের উপরও আলোকপাত করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত পুরুলিয়ার উত্তর ও উত্তর -পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ ও হাজারিবাগ জেলা,পশ্চিমে রাঁচি, দক্ষিণ - পশ্চিমে সিংভূম, উত্তর-পূর্বে বর্ধমান, পূর্বে বাঁকুড়া ও দক্ষিণ-পূর্বে মেদিনীপুর (পশ্চিম) অবস্থিত। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রে 'ঝাড়খন্ড' রাজ্যটির নাম সংযোজিত হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি। এই রাজ্যটির সৃষ্টির ইতিহাস জানতে হলে আমাদের কিছুটা অধ্যায় পিছিয়ে যেতে হবে। ঝাড়খন্ড রাজ্যের সৃষ্টির ইতিহাসের সাথে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপট ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঝাড়খণ্ডের পরিসীমার কথা জানতে হলে তাই আমাদের ফিরে তাকাতে হয় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জঙ্গলমহল ভেঙে জন্ম হয় মানভূমের, যার সদর দপ্তর স্থাপিত হয় মান বাজারে। ১৯৪৫ সালে নীহার রঞ্জন রায় তাঁর বিখ্যাত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসঃআদিপর্ব' গ্রন্থে বলেছেন 'বাংলার পশ্চিম সীমা পূর্ব সীমাপেক্ষাও খর্বকৃত হইয়াছে।' পশ্চিম সীমান্তে অঞ্চলটির কথা তিনি বলেছেন তা হলো মানভূম। তখন মানভূম; বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানভূম ছিল তখন একটি জেলার নাম। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৮ পর্যন্ত মানভূমের জেলা সদর ছিল মানবাজার। মানভূমের সদর প্রশাসনিক ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আগাগোড়াই ছিল ছোটনাগপুর ডেপুটি কমিশনারের হাতে। মানভূমের ৭০ শতাংশ লোকের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও হিন্দি ভাষাকে এই অঞ্চলের মানুষদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়।ফলে বাংলা ভাষাভাষীর মানুষের সাথে হিন্দি ভাষীদের একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। বাংলাভাষীরা এক্ষেত্রে হিন্দিভাষী দের উপর গর্জে ওঠে ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালে কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে ভারতে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হলে পুরুলিয়ায়ও শুরু হয় ' টুসু সত্যাগ্রহ'।মানভূম জেলায় তখন দুটি মহাকুমা ছিলঃ একটি-পুরুলিয়া মহাকুমা, যার অধীনে সতেরো টি থানা (পুরুলিয়া,বলরামপুর, হুরা, আড়ষা,ঝালদা,জয়পুর, চান্ডিল,পুঞ্চা, রঘুনাথপুর, সাঁতুড়ি, নিতুরিয়া, মানবাজার পটমদা, বরাবাজার,কাশীপুর, বাঘমুন্ডি,ইছাগড়)বিন্যস্ত ছিল। অপরটি-ধানবাদ মহাকুমা। এর মধ্যে আটটি থানা (ধানবাদ, চাষ, গোবিন্দপুর, নিরসা, টুন্ডি, বাঘমারা কাতারাস, ঝরিয়া) ছিল। ১৯৫৩- ৫৫ সাল পর্যন্ত মানভূমের মাটিতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের জোরদার আন্দোলন চলে। অবশেষে, ১৯৫৬ সালে 'Bihar and West Bengal Transfer of Territories act' আইন পাশ হলে মানভূমকে ভেঙে তিন টুকরো করা হয়। যার ফলে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ধানবাদ, চন্দনকেয়ারি ও চাষ-কে পৃথক করে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে মানভূমকে যখন ভেঙে তিন টুকরো করা হয় তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে উত্তরের শিল্পাঞ্চল ধানবাদ কে বিচ্ছিন্ন করে বিহারের একটি নতুন জেলার সৃষ্টি করা হয়। কাতরাস, ঝরিয়া আদিমহল রয়ে গেল এই নতুন জেলায়। জামশেদপুর শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখার জন্য দক্ষিণ- পশ্চিমাংশ জুড়ে দেওয়া হল সিংভূম জেলার নতুন মহকুমা সরাইকেলার সঙ্গে। অবশেষে ১৯৫৬ সালে ১ নভেম্বর অবশিষ্ট মানভূমের অংশ (বৃহত্তর) পুরুলিয়া নাম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পৃথক জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে৷ অন্যদিকে ২০০০ সালে ১৫ নভেম্বর বিহারকেও ভেঙে পৃথক করে নতুন রাজ্য ঝাড়খণ্ডের জন্ম হয়।

সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষ করে আজকের প্রশাসনিক নথিপত্রে মানভূম শব্দটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেলেও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মানভূম সেদিনও ছিল, আজও আছে; কিছুটা বর্তমান ঝাড়খণ্ড,

কিছুটা ওড়িশা এবং অনেকটা পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রিক সীমানায়। আলোচ্য নিবন্ধের ক্ষেত্রটিতে ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা কথিত। আলোচ্য সিন্দ্রী-ডোমগড় অঞ্চলটি ধানবাদ জেলাভুক্ত ভাষার সাহায্যে মানুষ তার মনের ভাব ব্যক্ত করে। মানুষের চিন্তা ও মননের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হলো ভাষা।শুধু তাই নয় যেকোন দেশের জাতির ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকও হলো ভাষা।একসঙ্গে বসবাসকারী বহু ভাষাভাষীর মানুষ এই ভাষার মাধ্যমে ভালোবাসার আদান-প্রদান করেন। যেমন; সাঁওতালি, খর্থা কুড়মালি হিন্দি প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা এত ঘনিষ্ঠ কেন তা অনুসন্ধান করেছেন ডক্টর সুহৃদ কুমার ভৌমিক তাঁর 'আদিবাসীদের ভাষা ও বাংলা' গ্রন্থে। তার মতানুসারে চর্যাপদে দেখি সাঁওতাল তথা সমগ্র আদিবাসী জীবনের বিস্তৃত ছবি। সে চিত্র এখনো জীবন্ত ভাবে দেখতে পাই ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে - যার সীমানা রাঁচি, হাজারীবাগ, পালামৌ, ধানবাদ থেকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূমে এসে ঠেকেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

" মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা। "- এই বাণীতে লুকিয়ে আছে বাংলা ভাষার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কিন্তু এই বাংলা ভাষাকে নিয়ে ভারতের মাটিতে রাজনীতিও কম হয়নি। বলাই বাহুল্য, আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকেও এই রাজনীতির শিকার হতে হয়েছে কখনো কখনো। ভাষাকে কেন্দ্র করে দেশ,জাতি, রাজ্যের বিভাজনের সাক্ষী থেকেছে মানুষ যুগে যুগে। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধেও আমরা দামোদর তীরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ড সীমানা লাগোয়া অঞ্চলের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ও তার ফলস্বরূপ সৃষ্ট নতুন ভাষা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি এই ভাষাকেন্দ্রিক আঞ্চলিক বিভাজনের ইতিহাসের উপরও আলোকপাত করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত পুরুলিয়ার উত্তর ও উত্তর -পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ ও হাজারিবাগ জেলা,পশ্চিমে রাঁচি, দক্ষিণ - পশ্চিমে সিংভূম, উত্তর-পূর্বে বর্ধমান, পূর্বে বাঁকুড়া ও দক্ষিণ-পূর্বে মেদিনীপুর (পশ্চিম) অবস্থিত। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রে 'ঝাড়খন্ড' রাজ্যটির নাম সংযোজিত হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি। এই রাজ্যটির সৃষ্টির ইতিহাস জানতে হলে আমাদের কিছুটা অধ্যায় পিছিয়ে যেতে হবে। ঝাড়খন্ড রাজ্যের সৃষ্টির ইতিহাসের সাথে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপট ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঝাড়খণ্ডের পরিসীমার কথা জানতে হলে তাই আমাদের ফিরে তাকাতে হয় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জঙ্গলমহল ভেঙে জন্ম হয় মানভূমের, যার সদর দপ্তর স্থাপিত হয় মান বাজারে। ১৯৪৫ সালে নীহার রঞ্জন রায় তাঁর বিখ্যাত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসঃআদিপর্ব' গ্রন্থে বলেছেন 'বাংলার পশ্চিম সীমা পূর্ব সীমাপেক্ষাও খর্বকৃত হইয়াছে।' পশ্চিম সীমান্তে অঞ্চলটির কথা তিনি বলেছেন তা হলো মানভূম। তখন মানভূম; বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানভূম ছিল তখন একটি জেলার নাম। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৮ পর্যন্ত মানভূমের জেলা সদর ছিল মানবাজার। মানভূমের সদর প্রশাসনিক ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আগাগোড়াই ছিল ছোটনাগপুর ডেপুটি কমিশনারের হাতে। মানভূমের ৭০ শতাংশ লোকের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও হিন্দি ভাষাকে এই অঞ্চলের মানুষদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়।ফলে বাংলা ভাষাভাষীর মানুষের সাথে হিন্দি ভাষীদের একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। বাংলাভাষীরা এক্ষেত্রে

হিন্দিভাষী দের উপর গর্জে ওঠে ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালে কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে ভারতে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হলে পুরুলিয়ায়ও শুরু হয় ' টুসু সত্যাগ্রহ'।মানভূম জেলায় তখন দুটি মহাকুমা ছিলঃ একটি-পুরুলিয়া মহাকুমা, যার অধীনে সতেরো টি থানা (পুরুলিয়া,বলরামপুর, হুরা, আড়ষা,ঝালদা,জয়পুর, চান্ডিল,পুঞ্চা, রঘুনাথপুর, সাঁতুড়ি, নিতুরিয়া, মানবাজার পটমদা, বরাবাজার,কাশীপুর, বাঘমুন্ডি,ইছাগড়)বিন্যস্ত ছিল। অপরটি-ধানবাদ মহাকুমা। এর মধ্যে আটটি থানা (ধানবাদ, চাষ, গোবিন্দপুর, নিরসা, টুন্ডি, বাঘমারা কাতারাস, ঝরিয়া) ছিল। ১৯৫৩- ৫৫ সাল পর্যন্ত মানভূমের মাটিতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের রাজ্য ঝাড়খণ্ডের জন্ম হয়।

জেলায়। জমশেদপুর শিল্পাঞ্চল-এর সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দক্ষিণ পশ্চিমাংশ জুড়ে দেওয়া হল সিংভূম জেলার নতুন মহকুমা সবাইকেলার সঙ্গে। অবশেষে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর অবশিষ্ট মানভূমের অংশ (বৃহত্তর), পুরুলিয়া নাম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পৃথক জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। অন্যদিকে ২০০০ সালে ১৫ই নভেম্বর বিহারকেও ভেঙে পৃথক করে নতুন রাজ্য ঝাড়খণ্ডের জন্ম হল।

সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষ করে আজকের প্রশাসনিক নথিপত্রে মানভূম শব্দটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেলেও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মানভূমের প্রভাব সেদিনও ছিল, আজও আছে; কিছুটা বর্তমান ঝাড়খণ্ড, কিছুটা ওড়িশা এবং অনেকটা পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রিক সীমানায়। আলোচ্য পশ্চিমবঙ্গের সীমানা লাগোয়া দামোদর নদ তীরবর্তী ঝাড়খন্ডের ক্ষেত্রটিতে ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা প্রচলিত হলেও এখানে সিন্দ্রী(এশিয়ার প্রথম সার কারখানা FCI এই সিন্দ্রীতেই অবস্থিত। বর্তমানে হার্ল কোম্পানি (HURL: Hindustan Urbarak Research Limited) এখানে প্লান্ট বসায়। ফলে পুনরায় উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ডোমগড়, ভওরা, বিরশিবপুর, অধিকাংশ আলোচ্য অঞ্চলে ঝাড়খন্ডী উপভাষা থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কথ্যভাষার রূপ ও রীতি প্রচলিত।

লেনার্ড ব্লুমফিল্ড তাঁর 'Language' গ্রন্থে ভাষাসৌধের পাঁচটি তলের কথা বলেছেন। সেগুলি হল: Literary Standerd, Colloquial Standard, Provincial Standard, Sub Standerd এবং Local Standerd।

প্রাদেশিক মান্যভাষা বা Provincial Standerd অনুযায়ী এতদ্ অঞ্চলে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার সাথে খোরটা/ খোট্টা ভাষা মিশ্রিত পৃথক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ বাংলা ভাষার ভিন্ন রূপ প্রচলিত। এছাড়াও সাঁওতালি ও খোরটা ভাষা পৃথক কথ্য ভাষা হিসেবে স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার।

পার্শ্ববর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার দামোদর তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষও এই ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় কথার বলার ফলে এবং দামোদর নদকে মাধ্যম করে দুই রাজ্যে নদী পথে আসা যাওয়া, ভাব-ভাষার মেলবন্ধন এখানকার স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষার প্রভাব থাকলেও বহু বছর ধরে বিভিন্ন জাতি, ভাষাভাষীর মানুষ একত্রে বসবাস করায় এই অঞ্চলের ভাষায় কিছু নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যা ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্যকেও ছাপিয়ে গেছে। বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দ এখানে প্রচলিত যা এই অঞ্চলের নিজস্ব। ফলে বহু ভাষাভাষীর এই অঞ্চলে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার (Dialect) অন্তর্গত বিভাষা (Sub-Dialect) তৈরী হয়েছে। আমাদের

আলোচনার পরবর্তী ধাপে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য এবং এতদ্ অঞ্চলের ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক শব্দ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এতদ্ অঞ্চলের নিজস্ব বিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

প্রথমে এক নজরে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে নেওয়া যাক।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য:

ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১. 'ও'-কারের 'অ'-কার প্রবণতা। যেমন: লোক > লক, চোর > চর।

২. অপিনিহিতি ও বিপর্যাসের ফলে শব্দের মধ্যে আগত

স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ। যেমন সন্ধ্যা > সাঁইঝ > সাঁইঝ, কাল > কাইল > কাইল, রাতি > রাইত > রাইত।

৩. অনুনাসিক স্বরধ্বনির বহুল ব্যবহার। যেমন চাঁ, উঁট, আঁটা।

৪. অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ উচ্চারিত হয়। যেমন দূর>ধুর।

খ) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১. নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি '-কে'-র ব্যবহার লক্ষিত।

যেমন: বেলা পড়ে এল জলকে চল।

২. নাম ধাতুর বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। যেমন : হমর ঘরে চর সাঁদাইছিল(সিঁধিয়েছিল),

৩. অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন - নু, -লে, -রু।

যেমন, মাসের শুরুলে জল পড়া শুরু (মাসের প্রথম থেকে বৃষ্টি পড়া শুরু)।

৪. ক্রিয়াপদে স্বার্থিক -'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন:

ঘর যাবেক নাই?

৫. সম্বন্ধ পদে ও অধিকরণে বিভক্তিহীনতা অর্থাৎ শূন্যবিভক্তি দেখা যায়। যেমন: কাল রাইত কলিকাতা যাইব।

৬. অধিকরণের বিভক্তি হল: 'কে'। যেমন: আজ রাতকে

ভারি জাড়াবে।

৭. যৌগিক ক্রিয়াপদে 'আছ্', ধাতুর বদলে 'বট্' ধাতুর ব্যবহার হয়। যেমন: ছেলাটা ভালো খেলে বটে।

দ্বিতীয়ত: দামোদর তীরবর্তী ঝাড়খণ্ড সীমানায় অবস্থিত অঞ্চলের নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ট্য :

ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১. উচ্চারণের সুবিধার জন্য পদের আদিতে একক বা যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন : স্পর্ধা > আস্পদ্দা। ইংরেজি শব্দ : স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন।

২. উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা কষ্ট লাঘব করবার জন্য যুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন: ম্লেচ্ছ > মেলেচ্ছ, সংক্রান্তি > সংকেরান্তি,

যাচ্ছে > যাইচ্ছে, মধ্যে > মইধ্যে। ইংরেজি শব্দ। ফিল্ম > ফিলিম, গ্লাস > গেলাস, প্লেট > পেলেট, ব্লেড > বেলেড।

৩. শব্দ মধ্যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বা কখনো দুটি ধ্বনির মাঝখানে কোনো অতিরিক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলে, অর্থাৎ মধ্যব্যঞ্জনাগম ঘটে। যেমন ব্লাউজ > বেলাউজ,

কাঠাল > কাঁঠহাল, গড়ন > গড়হন, কুমোর > কুমহোর, > কামহার, কুড়াল > কুড়হাল।

৪. শব্দের শেষে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে।

যেমন : আসল > আসলি, নকল > নকলি, আলসা >

আলসামি, পিণ্ড > পিন্ডি, পেঁপে > পিপা।

৫. আলোচ্য ক্ষেত্রে কখনো কখনো নাসিক্যধ্বনির পূর্ণ বিলোপ ঘটে না, অর্থাৎ অর্ধ নাসিক্যীভবন ঘটে। যেমন : অন্ধকার > আঁধার > আঁনধার, ছিদ্র > ছেঁন্দা, ফাঁদ > ফাঁনদ, স্কন্ধ> কাঁধ।

৬. দন্ত্যধ্বনি (ত্, য্, দ্ ধ্ ইত্যাদি) মূর্ধন্যধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন : বালতি > বালটি, বৃদ্ধ > বুড়হা, বারান্দা > বারেন্ডা, তির্যক > ট্যারহা।

৭. 'ন' ধ্বনির 'ল' ধ্বনিতে রূপান্তর এতদ্ অঞ্চলের অন্যতম ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। যেমন: নাগাদ > লাগাদ, নাভি > লাহি।

৮. তালব্যীভবনের প্রয়োগ ঘটে অর্থাৎ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ তালুকেও স্পর্শ করে। যেমন । বাৎসরিকী > বছরকি, সিদ্ধ > সিঝা, শুচিবাই > ছুই ছুই।

৯. দন্ত্য ধ্বনি ব্যতীত অন্যান্য ধ্বনি কখনো কখনো দন্ত্যধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন : মাপ > নাপ।

১০. সঘোষ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : বর্ণের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনির প্রথম ধ্বনিতে রূপান্তর যথাক্রমে: ভুঁড়ি > ভুঁটি, রিজার্ভ > রিজাপ।

১১. এতদ্ অঞ্চলে পদ মধ্যস্থিত দুটি সমধ্বনির মধ্যে একটি বদলে গিয়ে বিষমীভবন ঘটায়। যেমন: নাড়ি > লাড়ি, করলা > কল্ লা, শরীর > শরীল, ভাণ্ডার > ভাড়াল, নাড়ু > লাড্ডু, নিচ্ছি > লিচ্ছি।

১২. বর্ণের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও 'হ্' ধ্বনি হল মহাপ্রাণ ধ্বনি। মহাপ্রাণ ধ্বনি ব্যতীত অন্যান্য অল্পপ্রাণ ধ্বনি এখানে মহাপ্রাণ ধ্বনির সন্নিকটে এসে মহাপ্রাণ রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন: এঁটো > আঁইঠো, বটি > বঁঠি, এঁটেল > এঁঠেল।

১৩. প্রগত সমীভবনের ফলে পরবর্তী ধ্বনি, পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন: শুক্রবার > শুককুর বার, প্রস্রাব > পিসাব। আবার পরবর্তী ধ্বনি আগের ধ্বনিকে পরিবর্তিত করে পরাগত সমীভবন ঘটায়। যেমন : কর্পূর > কপ্পুর, তিক্ত > তিতা, মাকড়সা > মাকস্সা, পাঁচশো > পাঁশশো, করলা > কললা, উচ্ছে > উইছছ্যা, কার্তিক > কাততিক।

১৪. শব্দের মধ্যে কাছাকাছি অবস্থিত বা সংযুক্ত দুটি ধ্বনি নিজেদের মধ্যে স্থান বিনিময় করে বিপর্যাস ঘটায়। যেমন : ট্যাক্সি > ট্যাসকি, পিশাচ > পিচাশ, রিক্সা > রেসকা / রিসকা, আন্দাজ > আনজাদ, বাক্স > বাস্ক।

১৫. 'প্রচুর' শব্দের পরিবর্তে 'দমে' শব্দের ব্যবহার লক্ষনীয়।

১৬. কোন কোন শব্দের অন্তর্গত 'চ' অনেক সময় লোপ পায়, যেমন : সূঁচ > সুই।

১৭. কোন কোন শব্দের গোড়ায় 'এ' ধ্বনির বদলে “অ্যা” ব্যবহৃত হয়। যেমন: পেট > প্যাট, তেল > ত্যাল।

খ) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১. সামান্য অতীতে উত্তম পুরুষে ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লি', প্রথম পুরুষে '-ইল'। যেমন: আমি খেলাম > আমি খাইলি, আমি বললাম > আমি বইললি, তুই খেলি? > তুই খাইলি?, সে বলল > সে বইলল।

২. অকারণ অনুনাসিকত্ব এখানকার Length প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন: হুঁ, আঁর, ওঁ,উঁট।

৩. ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মত অপিনিহিতি ও বিপর্যাসের ফলে শব্দের মধ্যে আগত বা বিপর্যস্ত স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ হলেও এই অঞ্চলে অপিনিহিতির প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন: সন্ধ্যা > সাঁইঝ, কাল > কাইল, রাত > রাইত, লেগেছে > লেইগেছে।

৪. উত্তম পুরুষের একবচনের সর্বনাম হল - 'আমি' / 'হামি'।

৫. উত্তম পুরুষের একবচনের সম্বন্ধপদ - 'আমার'/ 'হামার'।

৬. সম্বন্ধ পদের বিভক্তি হল 'র' যেমন: 'বাপের ঘর'।

৭. গৌণ কর্মের বিভক্তি হল '-কে'। যেমন: আমাকে।

৮. যৌগিক ক্রিয়াপদে 'আছ' ধাতুর বদলে 'বট্' ধাতুর ব্যবহার বহুল। যেমন: বান্ধে জল নাই বটে।

৯. ক্রিয়াপদে স্বার্থিক '-ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন
হবেক নাই, যাবেক নাই।

১০. অপাদান কারক বিভক্তি 'লে'। যেমন: এপ্রিল মাসলে নাম গরম দিবে।

১১. অধিকরণের বিভক্তি হল 'তে'। যেমন : আইজ রাইতে দমে ঘুমাইনবে।

১২. শিষ্ট চলিতের পদাশ্রিত নির্দেশক 'টা' বা 'টি' আলোচ্য ক্ষেত্রের কথ্য ভাষায় কেবল 'টা' হয়। যেমন: লোকটা > লকটা দুটো > দুটা, তিনটে >তিনটা, চারটে > চারটা।

১৩. 'গুলি' পদাশ্রিত নির্দেশক টি আঞ্চলিক কথ্যে 'গুলা', 'গুলান' ইত্যাদি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন সবগুলো > সবগুলান, এতগুলো > অ্যাতোগুলান।

১৪. আলাদা আলাদা শ্রেণীর পুরুষ বাচক রূপ 'আর' সংযোজক অব্যয় দিয়ে যুক্ত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে 'আর' সংযোজক বসে। যেমন: আমি আর উয়ারা সকলে মিলে যাইব।

১৫. সম্বোধনে মহিলাদের মুখে 'হ্যাগো', 'হ্যালো' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যা রাঢ়ি উপভাষাতেও লক্ষণীয়।

যেমন: হ্যাগো বৌদি, তুমি আজ রাঁইধাবাড়া কইরবেক কিনা?

১৬. যৌগিক কালে - ইল > -ল সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন গেলছে, খেলছে।

এতদাঞ্চলে বহু ভাষাভাষীর মানুষ একত্রে বসবাস করার অন্যান্য ভাষার সাথে বিশেষ করে হিন্দী, ইংরেজি , অলচিকি, খোরটা আঞ্চলিক ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। ফলে এখানকার কথ্য বাংলা ভাষায় উপরিউক্ত ভাষাগুলির সংমিশ্রণ ঘটেছে। ফলে বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দের প্রচলন এখানে দখতে পাওয়া যায়। এদের নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল :

**আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ __ চলিত ভাষায় প্রতিশব্দ

বিহা - বিয়ে

বান যাওয়া - স্নান করতে যাওয়া / শৌচালয় যাওয়া

মেয়া- মেয়ে/ মহিলা/ স্ত্রী

চিরুণ- চিরুনি

খানি- টুকরো

লে- থেকে

ভুঁটি- ভুঁড়ি

নুনু - ছোটছেলে

নুনি- ছোটমেয়ে

কানি- কাপড়ের টুকরো / ন্যাকরা

ডিংলা- কুমড়ো

কুকুর - কাল্ডালি-ঝগড়া

পাঘা- গোরু বাঁধার দড়ি

গৎগত- মোটাসোটা

ঘি-কল্লা- কাকরোল

কুলহি- এলাকা

অঞ্জট - হোঁচট

বেড় - বেড়া

দরদার - দরাদরি

কাললা - করলা

লতঝিঙা- ঝিঙা

বগলে (হিন্দী প্রভাব) - পাশে

কিসিম (হিন্দী প্রভাব)- রকম

পালগ- পালং

কাপড়ালাতা- কাপড় চোপড়

আতুড়ি - আঁচিল

লাতা- ন্যাতা

আত আতুড়ি- নাড়িভুড়ি

ভালা - দেখা

ভাইলছে- দেখছে

কামিন- দাসী

পারা - মতন

ঝুড়গুন্ডা- চোরকাটা

পাইনছে- ব্যাথা লেগেছে

চ্যাঁকা- টক

লাহি- ওজন দাঁড়ি

ব্যাথা লেগেছে - পাঁইয়ে গেলছে।

পেয়ারা- আঞ্জিট

লাহি- দাঁড়ি-পাল্লা

লাইন কাঁটাইনছে- বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া

টোকরি-ঝুড়ি

কিসকে- কেন

সিনাব- স্নান করব

সিনান-স্নান।

বিটিছিলা- মহিলা

এক বেগ হইলছে- সাথে সাথে কিছু ঘটনা ঘটা

টমেটো - বিলাতি

পরের দিন - বিহান বেলাঅগ্রহায়ণ- আঘন

দড়ি- দলা

জল গরম(ফুটতে দেওয়া)করা - সনসনাইতে দেওয়া

আঞ্চলিক ভাষায় উপরিউক্ত প্রচলিত শব্দের প্রয়োগ:

১) কাল সকালে বিহা ঘর যাব।

২) উ ঘরে লাই, বান যাইছে।

৩) হামার মেয়া বড় বজ্জাত বটে।

৪) সিনায় এইসছিস কখন, এখনো চিরুন করলি নাই কেন?

৫) আমার / হামার ঘরলে ইস্কুল আধা ঘণ্টার পথ বটে।

৬) বেশি বাড়িস নাই, ভুঁটি ফাসাইন দিব।

৭) ও হামার নুনুছেলা বটে।

৮) নুনি ইস্কুলে গেলছে।

৯) এতটুকু কানি কাপড় দিয়া মাড় গালা নাই যায়।

১০) আজ মাছের পাঁচটি খানি রাঁইধেছি।

১১) ডিংলা কত কইরে?

১২) লকের ঘর যারা কুকুর কাঙালি ক্যান করিস ?

১৩) জলটাকে সনসনাইতে দাও।

১৪) ও যাইতে খুঁইজছেনা।

১৫) ও খেতে খোঁজে না।

১৬) উঠানে অ্যাকটা দলা টাঙায়ে দাও।

১৭) গোরুটায় পাঘা কেন নাই পড়াস?

১৮) ছেলাটা ভারি গৎগতাইনছে।

১৯) বাজারে ভালো ছি-কলা আইসেছে

২০) ওটা ওস্তাদের কুলহি। ওখানে যাইও না।

২১) দ্যাখে চলো রাস্তটায় ম্যালা খন্দর বটে!

২২) ঘরের চাইর পাশটাতে বেড় দিয়া আছে।

২৩) কাপড়টা দরদার কইরে কিন।

২৪) উহার খ্যাতে ম্যালা কাললা ফইলছে।

২৫) আজ লতঝিঙা রাঁইধবো গো।

২৬) ওর ঘর হামার বগলের বটে।

২৭) ওখানে ম্যালায় হরেক কিসিমের দুকান লেইগেছে।

২৮) আইজ পালগ শাগ রাঁইধবো।

২৯) এবার পূজায় দমে কাপড়ালাতা লিব।

৩০) লকটার মুখে কত আতুড়ি গো!

৩১)ঘর পুঁইছবার লাতা দাও।

৩২) মাছের আত আতুড়ি দিয়া লাউ-এর সব্জিটা রাইধো।

৩৩) লকটা ক্যামন ক'রে ভালছে গো!

৩৪) মা হামি তরলে কামিন আইনতে যাইছি (বিয়ে করতে যাওয়ার সময় মা কে বলে যাওয়া)।

৩৫) ঝুড়গুণ্ডার ঝাড়ু দিয়া ভালো ঝাড় দিওয়ান যায়।

৩৬) নুনু ছেলাটা মায়ের পারা দেখতে হইনছে।

৩৭) ছেলাটার মাথায় পাঁইয়েছে।

৩৮) আমড়ার চাটনিটা দমে

চ্যাকাইনছে।

৩৯) নুনুছেলাটার লাহিতে ভালো কইরা ত্যাল দাও।

৪০) ওজন দাঁড়িতে ফাঁকি দিও না, আমি নাপ লেপে লিব।

৪১) বিজলি বিল ভরো নইলে লাইন কাটাইন দিবে।

৪২) বুড়হাটা অ্যাতো বয়সেও টোকরি কইরে সব্জি বেইচে ফিরে।

৪৩) মকর সংকেরান্তির দিন গঙ্গা সিনাব।

৪৪) গাঁ ঘরের বিটি ছিলাগুলো রোজ রাইতভোরে উইঠে সিনান করে।

৪৫) এ ঘরের মরদ গুলান আরাম কইরে বিটিছিলা গুলাকে খাটাইন মারে।

৪৬) আঘন মাসলে অনেক বিহার তারিখ বটে।

একটি উপভাষার অভ্যন্তরে নানা আঞ্চলিক পার্থক্যের ফলে যদি ভাষার একটি পৃথক রূপ গড়ে ওঠে তাকে বিভাষা বা Sub-Dialect বলে। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে আলোচ্য দামোদর নদ তীরবর্তী ঝাড়খন্ডে বর্তমান কালে ঝাড়খণ্ডী উপভাষা বৈশিষ্ট্যের সাথে আরো কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে দেখা গেছে। শুধু তাই নয়; এখানকার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পশ্চিমবঙ্গের উত্তর বীরভূমের 'রাঢ়ি' উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকেও অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে।

ঝাড়খন্ডের আলোচ্য ক্ষেত্রটি মানভূমি সাংস্কৃতিক কোণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই অঞ্চলের কথ্য ভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলোচ্য অঞ্চলের ভাষাকে মানভূমি বিভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কিনা সেই বিষয়ে ভাবনা চিন্তার অবকাশ রয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র:

১. সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – ড. রামেশ্বর শ’

২. উত্তর বীরভূমের আঞ্চলিক ভাষা - ড. মৃণালকান্তি দাস।

৩. ঝুমুর-নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

৪. পুরুলিয়ার সাহিত্য-সংস্কৃতি রাজন্য অবদান- প্রবীর সরকার।

৫. ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা-ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা।

৬. ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য — ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত।